শেষকথা

আলোচনা বা সমালোচনা নয়, এই শেষ পাতাসমূহ মূলত পূর্ববর্তী অধ্যায়রাশির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন, কিয়ৎ স্বীকারোক্তি এবং মাননীয় দু-চারজন আলোচকের সমালোচনা বিষয়ে দু-চারকথা— শঙ্খ ঘোষের কবিতা মানুষের জন্য এক-পৃথিবী আলোর কবিতা আর তাতে লুকিয়ে আছে কবির চারপাশের তাকানো, নিজের দিকে তাকানো এবং নিজের 'বোধমতো সত্যি', নিজের কাছে কোনরকমের ফাঁকি না রেখে। আলোচ্য যে, এই 'সত্যি' মূলত 'সংকট'। তবে সংকটরাশির বিস্তারে-বিস্তারে তাঁর কবিতা ইতি না হয়ে পরতে-পরতে বিস্তারিত বাঁচার আকুতি, ভালোবাসার আঁচলের খোঁজ; আর তা বড়ো মায়া-বেদনাময়। আবার তবে, এই বাঁচার ও ভালোবাসার কথা প্রকাশে তিনি অকুণ্ঠিত এবং অবস্থান 'বিপদসংকুল' স্থানে। 'বিপদসংকুল' স্থানে কেন? কেননা, তিনি কেবলমাত্র নিরাপদ দূরত্বে থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের-আপোষের জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে বাঁচার ও ভালোবাসার কথা-চিত্র অঙ্কনের শিল্পী নন; তিনি একজন সত্যিকারের শিল্পী হয়ে মানুষের মুখোমুখি বসে, পায়ে পা মিলিয়ে হেঁটে, হাতে হাত রেখে প্রতিবাদ করে লেখেন, লিখেছেন। তিনি ঐতিহ্য সচেতন এবং আত্মপরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত শব্দাশ্রয়ী হিসেবে নয়, শব্দাতিক্রমী কবি হিসেবে। শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিয়েই তাঁর আঁকা পরম্পরাকে সমকালের নিরিখে অথবা ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে নিজস্ব স্বরে। এই আত্মপরিচয়ের সন্ধানে তাঁর প্রথম পাঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহীরুহ— তাঁর সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে শিকড়-বাকড়, শাখা-প্রশাখা এবং পাতার মতো ব্যাপ্ত। এই বিরাট-মহৎ প্রাণের রচনাসমগ্র তাঁর সমকাল তো বটেই, পরবর্তীকাল ও তৎপরবর্তীকালেও গৃহিত এবং আত্মস্থ করে স্বাতন্ত্র্যদীপ্তি পেয়েছে। শঙ্খ ঘোষের কবিতাসমগ্রের বিভিন্ন কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টির উপস্থিতি উজ্জ্বল— তবে সবটাই মর্মস্থ করে নিজস্ব স্বরে, অসামান্য আলোয়।

শঙ্খ ঘোষ মূলত কাল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সমাজ-দেশ-দেশাতীত পটভূমিতে নিজেকে স্থাপন করে কবিতার মাধ্যমে তাঁর আত্মদর্শন ও আত্ম-আবিষ্কার, প্রকাশ সম্পন্ন করে চলেছেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-ঐতিহ্য তাঁর মজ্জায়-মজ্জায় এবং বহির্বাস্তব বিশ্ব ও সমাজ কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্ক অতি গভীর। কারণে, সমষ্টির সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উত্থান-পতন-বিপর্যয়ের অভিঘাতের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার মেলবন্ধনে লেখেন সমাজ-সভ্যতা-ব্যক্তিসংকটকথা। এই কবির জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে কবিতা ছিল প্রথম উদ্বোধন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা সমকালের নাগপাশে আবদ্ধ না হয়ে শাশ্বতের অভিমুখে নিরন্তর যাত্রা করেছে আর তাতে মিশে গেছে— খণ্ড-অখণ্ড; রূপ-অরূপ; ক্ষণকাল-চিরকাল; পল-অনুপল; সীমা-অসীম; বস্তু-সত্তা; ব্যক্তিসমগ্র-

বিশ্বসমগ্র। কবির বিশ্বাস সর্বশুভে— তাঁর আনন্দ-প্রেম একই সঙ্গে ব্যক্তিমুখী এবং বিশ্বমুখী। তিনি সত্য-শিব-সুন্দরের মধ্যে কোন বিরোধ দেখেন না— সমগ্রতার দ্যোতনাতেই কবির আস্থা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার অধিকাংশস্থলে খণ্ড-খণ্ড অভিজ্ঞতা একত্র হয়ে অখণ্ড-মিলন মুক্তির অভিজ্ঞতা হিসেবে ধরা দিয়েছে। দুঃখ-যন্ত্রণা-ব্যর্থতা-আঘাত যাবতীয় 'না'-এর পাহাড় 'হ্যাঁ'-এর বিশ্বাসে এসে প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি প্রবল সংশয় প্রশ্ন অন্তর্দ্বন্দ্ব সমাজভাবনা ও ব্যক্তি ভাবনার সুতীব্র সংঘাতও প্রগাঢ় ঐক্যবোধ এবং কল্যাণময় সামগ্রিক আস্তিক্যবুদ্ধিময় রূপে অঙ্কিত। সমস্ত ব্যাকুল কান্না পরম মমতাময় সমগ্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বের অর্থাৎ ব্যাপকতা ও সর্বজনীত্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতাতেও দেখা যায় ভোগের অপার আয়োজনের ছবি এবং সুবিধাবাদী বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধ স্বর। দিন যাপনের গ্লানি কিংবা প্রাণ ধারণের যন্ত্রণা-বিপন্নতার মধ্যেই ফুটে ওঠে আত্ম-অধিকারের কথা; ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য ইচ্ছাশক্তি। আপাত দ্বিধাযুক্ত বিশ্বাসহীনতার কথা উচ্চারিত হলেও সেই কথার গভীরে রয়েছে অতি-প্রগাঢ় বিশ্বাসময়তা স্নেহ-ভালোবাসা। তাঁর কবিতা সমকালীন ইতিহাস-ঘটনা জারিত হয়েও এক নির্ভার শুদ্ধ উত্তাপের দিকে নিয়ে যায়— সমস্ত রকমের পরাজয়-ব্যর্থতা-মিথ্যাচার-শঠতা হীনম্মন্যতার ভেতরেও প্রাণবন্ত করে তোলে। অপার আত্মিক প্রাপ্তিতে ভরিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে সমস্ত কবিতার লাইন সাধারণভাবে শঙ্খ ঘোষের কবিতার অবয়বে-মননে-চিন্তনে বারবার জোর আঘাত করেছে— ''চিত্রা'' কাব্যগ্রন্থের 'ব্রাহ্মণ'; ''কল্পনা''; কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষশেষ'; ''কথা'' কাব্যগ্রন্থের 'দেবতার গ্রাস'; ''পরিশেষ'' কাব্যগ্রন্থের 'মৃত্যুঞ্জয়'। এছাড়াও রয়েছে রবীন্দ্র রচনাবলি-১১-এর ভূমিকা অংশ এবং আত্ম-আবিষ্কার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনন-ভাবনার চোরাস্রোত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেবতার গ্রাস' কবিতার পঙ্‌ক্তি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় বারবার নানা ভাবে ফিরে এসেছে। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''দিনগুলি রাতগুলি'' (১৯৫৬)-এর 'হোম করে নাও'; ''নিহিত পাতালছায়া'' (১৯৬৭) কাব্যগ্রন্থের 'যাব না সাগরে'; ''তুমি তো তেমন গৌরী নও'' (১৯৭৮) কাব্যগ্রন্থের 'প্রপাত'; ''প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে'' (২০১২) কাব্যগ্রন্থের 'ছেলের তর্পণ করছে বাবা' কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিদিন 'আমাকে' 'আমি' থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে 'সকল-আমি'-এর যৌগিকতার সম্পর্ককে দৃঢ় করেছেন। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে আত্মশক্তির কথা— তা কেবলমাত্র নিজের নয়, সকল মানুষের। এই আত্মশক্তি-অনুভবী সৌন্দর্যের শিকড়স্থান উপনিষদ-প্রকৃতি-জীবন পাঠ। কবি শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঐতিহ্য হিসেবে তাঁর সৃষ্টি-সমীক্ষা জীবনে ধারণ করেছেন এবং আত্মনির্মাণ-উৎসারণের পথে নিয়ত ধাবিত হয়ে বিস্তারিত হয়েছেন ভাবীকালের জন্য। তাই কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার প্রত্যক্ষ পঙ্‌ক্তি ব্যবহার নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বাস প্রেম-ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রেম-সৌন্দর্য-আশ্রয়ের জগৎ শঙ্খ

ঘোষের অনেক কবিতার শিকড়স্থান। যথা— 'ঘন্টাঘর'— "তুমি তো তেমন গৌরী নও" (১৯৭৮) ; 'বাবরের প্রার্থনা'— "বাবরের প্রার্থনা" (১৯৭৬); 'আত্মঘাত'— "প্রহরজোড়া ত্রিতাল" (১৯৮০); 'স্তব'— "লাইনেই ছিলাম বাবা" (১৯৯৩)। তাঁর কবিতায় "বিসর্জন" (১২৯৬); "রাজা" (১৩১৭); "ডাকঘর" (১৩১৮); "মুক্তধারা" (১৩২১); "রক্তকরবী" (১৩৩১) এবং "চণ্ডালিকা" (১৩৪০) নাটকের উজ্জ্বল উপস্থিতি। এই সরল উপস্থিতি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনভাবনা এবং আলোতে বিশ্বাসী মনের মনন-চিন্তনরূপ বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে কবিতা এবং নাটক ব্যতিতও তাঁর গল্প উপন্যাস ও অন্যান্য মাধ্যমের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় শঙ্খ ঘোষের কবিতায়। তবে এই উপস্থিতির মাত্রা নিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন সমালোচকের ভিন্ন-ভিন্ন মতামত। কবি-সমালোচক অরুণ মিত্র লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সমালোচনাত্মক লেখা নজরে পড়েনি।' আবার অন্যদিকে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— 'আপনি কিন্তু প্রথম থেকেই রবীন্দ্রভক্ত। কিন্তু, অন্ধভক্ত নন।' এই সব পরস্পর বিপরীত সমালোচনার কথা পাশাপাশি রেখে এখানে একটি কথা স্মরণ করে নেওয়া দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শঙ্খ ঘোষের আজীবনের সমালোচনার ধন— শৈশবের আশ্রয়, যৌবনের স্পর্ধা, বিকেলের আশ্রয়— তাঁর রচনায় মিশে যাওয়া বা সমালোচিতভাবে উঠে আসা বা সময়ের পাঠে উঠে আসা অস্বাভাবিক নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা', 'ছুটি', গল্পের উপস্থিতি সময়ের-ভাবের নিরিখে উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন নারী-স্বাধীনতার, নারী-মূল্যায়ণে ছিলেন একান্ত আন্তরিক এবং উদার মানসিকতার তেমনি শঙ্খ ঘোষ। তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের লোভ-লালসা-পাশবিকতাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারবার কষাঘাত মেরেছেন এবং বোঝাতে চেয়েছেন পুরুষ বা নারী নয়, মানুষ আর মানবিকতা মূল। সময়-সমাজ-প্রেমের প্রেক্ষিতে নারীর ভূমিকা যে কতখানি সদর্থক-প্রত্যয়জাত তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পল-অনুপলে বুঝেছেন এবং মেনে নিয়েছেন। অন্যদিকে শঙ্খ ঘোষ—

"এই দেশে আমাদের জন্ম দিয়েছিলে বলে যেন
কোনো দুঃখ কোরো না কখনো। ভেবে দেখো, আজ থেকে
একশো বছর আগে কোনো এক রাগী যুবা কবি
গল্পশেষে চিতার আগুন পাশে সাজিয়ে 'এবার
বিশ-হাজার টাকা পণ, হাতে হাত আদায়' লিখেই
ভেবেছিল মোক্ষম চাবুক। কারোই কাঁপেনি বুক
সেই থেকে বুকে হেঁটে এত দূরে এসেছি এখানে।
আমরা তিন বোন আজ তোমার মুখের দিকে চেয়ে
চোখের পাথর দেখে বুঝে গেছি জীবনের মানে
হাতে তুলে দিই তাই তিন মুণ্ড যৌতুকের মতো।

আর যারা বর হয়ে দাঁড়াবে এ শামিয়ানাতলে
শেষের তর্পণে এসে নিজে তুমি তাদের হাঁ-মুখে
শরীরের খণ্ডগুলি গুঁজে দিয়ে বোলো 'খা— খা—'
আমাদের কথা ভেবে বিলাপ কোরো না তারও পরে।''[১]

এই কবিতা ছাড়াও তাঁর 'যমুনাবতী', 'বুড়িরা জটলা করে', 'রাঙামামিমার গৃহত্যাগ', 'কালযমুনা', 'আমার মেয়েরা', 'একটি মেয়ে, মাকে' ইত্যাদি কবিতায় নারীকে সামনে রেখে নারী-মানুষের বেঁচে থাকার কথা নান্দনিকভাবে কবিতায় তুলে এনেছেন।

বহু আলোচনায় আলোচিত যে, তিরিশের দশক হল আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা-যাত্রাকাল। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল ফ্রান্সে— বোদলেয়ারের " Les Fleurs du Mal" বা ''ক্লেদজ কুসুম'' (১৮৫৭) কাব্যগ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে। কবিতার ক্ষেত্রে এই আধুনিকতার বিস্তার এলিয়ট, ইয়েটস, রিলকে, সাঁ জন পার্স, ভালেরি, পাস্তেরনাক, আপলিনেয়ার, হিমেনেথ প্রমুখের সময়কালে। সমভাবে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবি আধুনিক বাংলা কবিতাশিল্পের পথপ্রদর্শক। পরবর্তীকালে সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতাতেও এই আধুনিকতা বর্তমান। তিরিশের দশকের কবি জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত প্রমুখের কবিতার স্বাতন্ত্র্য প্রেমচিত্রের মতো কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতাতেও স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর প্রেমচ্ছবি অঙ্কিত। স্বীকার্য অনিবার্য হয়ে ওঠে, যে কবির কাছে নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, বরং শব্দের নতুন সৃষ্টিই অভিপ্রায়— সেই কবি ভালোবাসার কাছে পৌঁছোন এবং সৃষ্টি করেন দেশ-কালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে নতুন প্রেম-কবিতা। প্রবল অস্ত্যর্থকতার জন্য তাঁর সমস্ত কবিতাই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে প্রেমের কবিতা— ভালোবাসার। আর এ কারণেই ভালোবাসার কবি শঙ্খ ঘোষ, বেঁচে থাকার এবং অন্যকে বাঁচতে শেখানোর কবি শঙ্খ ঘোষ।

সৃষ্টির মূলে আছে যন্ত্রণা— প্রকাশের যন্ত্রণা। অতএব, স্বীকার করতে বাঁধা নেই যে, এই যন্ত্রণা, শূণ্যতাবোধ বা বিচ্ছেদের মর্মযন্ত্রণা অর্থাৎ বিষাদ-নৈরাশ্য-নিরর্থকতা-উদ্বেগ-আশঙ্কা কবিতার পরতে পরতে লেগে আছে। তবে এই যন্ত্রণা প্রকাশের ধরণ বা মাত্রা ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে আলাদা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী কবিদের কবিতায়— বিশেষত জীবনানন্দ দাশ এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা-সংঘাত, মারি-মন্বন্তর-হানাহানি-খুনোখুনি; সিংহভাগ মানুষের বেকারত্ব-চাহিদা পূরণের অক্ষমতা; ঔপনিবেশিক শোষণ-বঞ্চনা; পর-পর ঘটে যাওয়া দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ফলাফল তাদের মানসিক-কাব্যিক যাপন-লেখনের শূন্যতা-যন্ত্রণাময় বেদী নির্মাণের রাস্তা পরিস্ফুট করেছে। মূলত জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আপাত বিষাদ-শূন্যতা-নৈরাশ্যবোধের জীবনকথা-ঘটনাসমূহকে বহুতলে বিন্যস্ত করেছেন। অন্যদিকে শঙ্খ ঘোষ

আশা-নিরাশার দ্বিকোটিক ভাবনায় সায় না দিয়েই তাঁর কবিতা সমস্ত নেতির মধ্যেও 'হ্যাঁ'-এ এসে নতুন সূর্যোদয়ের পথ আঁকেন। বিশ্বাস করেন আলো 'আছে— আছে কিন্তু। হয়তো অল্প তবুও আছে।' সমস্ত পরাভব তাঁর কাছে এসে জয়ের যাত্রা পায় এবং সমস্ত গ্লানি-হিংসা-মারামারি-খুনোখুনি-'জীবন অন্ধকার করে দেওয়া' থেকে মুক্তির কথা ভাবেন— 'মুক্তি যে নেই, এতটা ভাবতে ইচ্ছে করে না'। প্রশ্ন হল— একজন কবি যখন 'হ্যাঁ', 'মুক্তি'-এর কথা ভাবেন তবে নিশ্চয়ই 'না', 'বন্ধন'— বিষাদঅন্ধকার কোথাও আছে। শঙ্খ ঘোষের কবিতাতে বিষাদ-অন্ধকার মূলত চারদিক থেকে আসা— প্রেমহীনতা থেকে অথবা পরস্পর পরস্পরের দূরত্ব থেকে, দেশভাগ থেকে, সমাজ-দেশ-কালের বিসংগতি থেকে এবং আত্মহীনতা থেকে।

বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সময় সেন প্রমুখের মতো তাঁর কবিতাতে বিস্তারিত নাগরিক জীবনে কলা-কৌশল, তবে সমস্তটাই আত্মসমালোচনা বিজড়িত হয়ে। তিনি বিশ্বাসী এবং প্রার্থনারত— অথচ নগর জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় তাতে নগর জীবনের চতুরতা, ভণ্ডামি, ছল-ছলনা-কলা-কৌশল-লাস্য-হাস্য-বিলাসিতা; মূল্যবোধহীন দম্ভ-হাস্যরোল; মারামারি-খুনোখুনি; 'কলুষ মাখানো হাত'। এই অবস্থায় উচ্চারণ করেন— 'মিথ্যা শেষ হয়ে যাক, শেষ হোক আলোর চাতুরী'। লিখতে চান 'আয়ু'— আদরের সম্পূর্ণ মর্মর' কথা। নাগরিক জীবনের ছল-চাতুরী কবিকে ক্লান্ত করেছে তবে এই ক্লান্তির মাঝেও 'সমূহ প্রবাহ' পাবেন বলে দু-চোখ ভিজিয়ে নেন 'অন্ধকারে'— সেই আলোময় অন্ধকারে।

> ''আমি আছি, এই শুধু। আমার কি কথা ছিল কোনো?
> যতদূর ফিরে চাই আদি থেকে উপান্ত অবধি
> কথা নয়, বাঁচা দিয়ে সমূহ প্রবাহ পাব বলে
> এই দুই অন্ধ চোখ ভিজিয়ে নিয়েছি অন্ধকারে।''[২]

শঙ্খ ঘোষ যথার্থ জীবনের প্রকাশক অর্থাৎ সমাজের ব্যক্তি-সমষ্টির দায় তিনি নিজের করে নিয়েছেন। স্বাধীনতা উত্তরকালের এই কবির কাব্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ঘটনা— দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ, জীবনসংগ্রামের তীব্রতা সুচারু রূপ পেয়েছে সমালোচনা-আত্মসমালোচনা-ভালোবাসা সমন্বয়ে। ১৯৫১-তে যেমন লিখতে হয়েছিল 'যমুনাবতী', এদিন অর্থাৎ ২০০৭-এ তাঁকেই লিখতে হয় 'স-বিনয় নিবেদন'! আবার তারও পরবর্তীতে ২০১১-তে অর্থাৎ আরও একবার— ডান থেকে বাম-বাম থেকে ভিন্ন-ডানের শাসনকালে এসে লিখতে হয়—

> ''এখনও কি তুমি প্রতিবাদ করো?
> —মাওবাদী!
> প্রশ্ন করার সাহস করেছ?

—মাওবাদী
চোখে চোখ রেখে কথা বলো যদি
ঘড়ি-ঘড়ি সাজো মানবদরদি
আদরের ঠাঁই দেবে এ গারদই
মাওবাদী—
সহজ চলার ছন্দটা আজ
একটু না-হয় দাও বাদই!

দুই চোখে দেখি সর্ষেফুলের মতো থোকা থোকা
মাওবাদী
এখানে-ওখানে দোকানে-বাজারে-হাজারে হাজারে
মাওবাদী
বাঁকা হাসি দেখে ঠিকই চিনে যাই
মাওবাদী, তুমি মাওবাদী!''[৩]

না, এইসব কবিতা কেবলমাত্র 'নির্দিষ্ট' সময়ের সময়চিহ্ন নয়, কবির সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সচেতনতার 'জীবনজগৎজড়ানো' সংকটকথার মথিতরূপ। তাঁর আত্মার স্বর। তাতে চল্লিশের দশকের অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবির সমাজ মনস্কতা ও প্রতিবাদী চেতনা শঙ্খ ঘোষের কবিতায় সম্মাননীয় করুণায় গাঢ় হয়ে উচ্চারিত। মূলত তিরিশের কবিদের ব্যক্তি-সমাজসচেতনতা বা চল্লিশের কবিদের সমাজ-রাজনীতি সচেতনতা তাঁর কবিতায় সমগ্র সত্তা মথিত করে উঠে এসেছে। অন্ধকার সময়ে তিনি যেন একা লণ্ঠনধারী, শূন্যতার ভেতরে জীবনের ঢেউ, জানু পেতে বসে প্রার্থনারত পূজারী—

''এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত—
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।''[৪]

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আগামী প্রজন্মের জন্য পরম আলোর প্রার্থনা-ভালোবাসা, জন্মভূমির প্রতি মমতাময় কাতরতা, মানুষ-জীবনের প্রতি অমোঘ টান— ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচেতনার নেপথ্য স্বর-সুর। তাঁর কবিতাসমূহ মূলত নিষ্কম্প অন্তর্দৃষ্টির কবিতা— পরতে-পরতে আত্মসমীক্ষা, প্রেম-প্রতিবাদ, বেদনা ও উপশম। তবুও একজন সমালোচকের মতে—

''কিন্তু আজ শঙ্খ ঘোষের কবিতার সামনে দাঁড়িয়ে, পাঠক নিভৃতিকে দু-একটি

> মৃদু প্রশ্ন যেন-বা মনের ভিতর অনিচ্ছুকের চাপ সৃষ্টি করছে। প্রশ্ন হল— শঙ্খ ঘোষ বাংলা কবিতায় নতুন-কিছু দিয়েছেন কি? একদম নতুন-কিছু? লতাবীজের ঘন পরমম্পরায় যে-মানবপ্রেম এবং মানবতাবাদের ধারা চলে আসছে, শঙ্খ ঘোষ সেই মানবতাবাদেরই সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন তাঁর কবিতায়। যা নতুন-কিছু নয়। ... বরং 'দিনগুলি রাতগুলি' কবিতার ভাষা-ব্যবহারে আমরা আজ কিন্তু নতুনত্বের অভাবই বোধ করছি। ... ''[৫]

সত্যিই কি তাই? না। কেননা তিনি যে কবিতায় নিজস্ব ভাষা আবিষ্কার করেছেন এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যথা— কবিতার বাক্যের মধ্যেকার ঝোঁক, বাক্, ব্যঙ্গ, উপশম অথবা গঠন, শব্দ ব্যবহার, রূপক, চিত্রকল্প, অলঙ্কার, ছন্দ, মিথকলা ও প্রতীক-পুরাণের প্রয়োগ— নিয়তই জানিয়ে দেয় তাঁর উপস্থিতি এবং নিজস্বতা।

মূলত শঙ্খ ঘোষের সমকালীন অর্থাৎ পঞ্চাশের কবিদের ছেলেবেলা কেটেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সাইরেনের শব্দে— যুদ্ধ-বিপ্লবের যন্ত্রণাকাতর অনুভবে, বোম-আগুনের শব্দ-তাপে-মৃত্যুতে, জাতীয় জীবনের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। অতঃপর আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণ, যুদ্ধ-ধ্বংস-দখল-হত্যা, পুনরায় হত্যা-দখল-ধ্বংস-যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি। শান্তি রক্ষার্থে রাষ্ট্রসংঘ (১৯৪৫) গঠিত হয়! অন্যদিকে ভারতীয় রাজনীতির উত্তালপর্ব— দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-হাঙ্গামা-অনাহারে অগণিত মানুষের মৃত্যু; মৃত্যু-ক্ষয়-ক্ষতির পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা লাভ। অতঃপর উদ্বাস্তু আগমন-আন্দোলন-পুলিশের গুলি-মৃত্যু! খাদ্য আন্দোলন! কবি শঙ্খ ঘোষের সমকালীন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদার প্রমুখ বাংলা কবিতায় বলা চলে নতুনভাবে রক্ত সঞ্চার করলেন। শঙ্খ ঘোষ কবি-ব্যক্তিত্বের জোরে তাঁর কবিতায় নিজের স্বতন্ত্রতা প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন। নষ্ট সমাজ, দেশ, রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ শঙ্খ ঘোষকে ব্যতিক্রমী বলে চিহ্নিত করেছে। পঞ্চাশের অনেক কবিই ব্যক্তিগত জগৎকে কবিতার বিষয় করে তুলেছিলেন কিন্তু শঙ্খ ঘোষ ব্যক্তিকে দেখলেন দেশ-সময়-সমাজ তথা বিশ্বের পটে।

আলোচ্য যে, পঞ্চাশের মূল সুর 'আত্মস্বীকারোক্তিমূলক' অর্থাৎ—

> ''একটা নতুন কাব্যধারা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিদেশী ধাঁচে একটা কোন বিশেষ নাম দিয়ে কাব্য আন্দোলন আমরা শুরু করিনি, কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবিরা নিজেদের মধ্যে কোনওরকম পরামর্শ না করেই যে নতুন রীতিতে কবিতা লিখতে শুরু করে, তাকে বলা যেতে পারে স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা। এই কবিতা শুধু সৌন্দর্যের নির্মাণ নয়, রূপকল্পের সন্ধান নয়, এইসব কবিতা যেন তাদের রচয়িতাদের জীবনযাপনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িত।''[৬]

এই আত্মস্বীকারোক্তিবেলায় শঙ্খ ঘোষ যারপরনাইভাবে আত্মসমালোচনায় মুখর ও মরমী, বাঁচায় এবং বাঁচতে শেখানোর, প্রতিবাদী এবং ভালোবাসারও—

"জল কি তোমার কোনো ব্যথা বোঝে? তবে কেন
জলে কেন যাবে তুমি নিবিড়ের সজলতা ছেড়ে?
জল কি তোমার বুকে ব্যথা দেয়? তবে কেন তবে কেন
কেন ছেড়ে যেতে চাও দিনের রাতের জলভার?"[৭]

এই স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল কবি একই সঙ্গে সমালোচক ও অনুবাদক। শঙ্খ ঘোষের গদ্য রচনাগুলি মূলত আলোচনাভিত্তিক। এই আলোচনাসমূহে কবিতা-ছন্দকথা, শব্দ-নিঃশব্দ-সত্যকথা— আত্মাভিব্যক্তি এবং আত্মমোচনের অভিপ্রায়ে গভীরতর অর্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিসমগ্রে ডুব দিয়ে সমগ্র-রবীন্দ্রনাথকে অর্থাৎ রবীন্দ্র-ভাবনাকে তুলে এনেছেন; বিস্তারিত— কবিতার মুহূর্ত, কবিতাকথা, ঐতিহ্যধারা এবং সব-অলীককথা। এইসব আলোচনা কেবলমাত্র আলোচনার জন্যই আলোচনা নয় অর্থাৎ তথ্য ও তত্ত্ব-গদগদ, নীরক্ত, প্রথাগত, নীরস, লাবণ্যহীন গদ্যময় প্রবন্ধ নয়— মেধাযুক্ত-কাব্যিক। অন্যদিকে স্বরণীয় যে, অনুবাদ প্রকৃতপ্রস্তাবে কেবলমাত্র অনুবাদ নয়, অনুবাদ অনুবাদকের সত্তার প্রকাশ হয়ে ওঠে; কেবলমাত্র ভাষান্তর নয়— আন্তরভাষ্য। মূল কবিতার সঙ্গে অনুবাদকের সংস্কৃতি কখন যেন বিশ্বাসীভাবে মিলে গিয়ে অনূদিত কবিতা হয়ে ওঠে প্রাণময় এবং তাতে অনুবাদক নিজেকে আবিষ্কার করেন বিনীত উপায়ে। অনুবাদক শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে তদেব কথামালা স্মরণীয় এবং তিনি যেহেতু যথাযথ আবেগী-স্পর্শকাতর, সেইহেতু তাঁর অনুবাদ শিল্পকর্মও স্পষ্টতই স্পষ্ট। এই সমালোচক ও অনুবাদকের নির্মাণ-সৃষ্টি মানচিত্রে 'স্মৃতিলেখা', 'লোকজীবন', 'কবিতাকথা', 'শিল্পসাহিত', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে সমালোচনা পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে অনুবাদ করেন গিরিশ কারনাডের নাটক, নিকোলাস গ্যিয়েনের কবিতা, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক লেখা, ইরাকি কবিতা, ইকবাল-রচনা।

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় বর্তমান অস্থির যুগসংকটকথার সঙ্গে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে বিপুল ভালোবাসা-বিশ্বাসের মিলনভূমি দেখা যায়। বহুরৈখিক ঘটনার বহুতলিক প্রকাশে আত্মসাক্ষাৎ অনিবার্য স্পন্দনে স্পন্দিত হয়। কিছু ব্যঙ্গ, কিছু অসহায়তা— সত্তার আকুতি নিয়ে সমগ্র হয়ে ওঠে। মূলত মন্ময় কবিতা অর্থাৎ উচ্চারণ ব্যক্তিগত অথচ পরতে-পরতে সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রগাঢ় ছায়া। তিনি শব্দের সীমা ভেঙে অতলে ডুব দেন আবার নিঃশব্দের সীমা শব্দ দিয়েই স্পর্শ করেছেন— তাতে আড়াআড়িভাবে অঙ্কিত হয় নিশীথনগরের সকল অভিজ্ঞতা। তাঁর কবিতার বিষয়— জীবনচিত্র, আর উপায়— চিত্রকল্প। তাতে অনায়াসে ইতিহাসকে ধারণ করে 'তুমি' 'আমি' 'আমাদের' সমাজ দেশ-কালের কথা অলংকরণ এবং অলংকরণহীন ভাবে উঠে এসেছে।

''কবিতার প্রতিমা আজ তাই কবির কাছে উপকরণ মাত্র নয়। এক হিসেবে এটা তাঁর যুদ্ধেরও চিহ্ন। অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে লগ্ন হবার, অথবা জীবনের প্রত্যক্ষ সংঘাতে নিজের বোধকে চিনে নেবার দায়িত্ব কবির : কবি আর জীবনের মধ্যে এই সংঘর্ষের সম্পর্ককে ধরিয়ে দেয় প্রতিমা। তাই এর প্রয়োগে এসে যায় সমকালীনতা, স্থানকালে বিশেষিত অভিজ্ঞতার চাপ তৈরি হয় কবিতার শরীরে। আবার এরই সঙ্গে চলতে থাকে অত্মগঠনেরও প্রক্রিয়া, ব্যক্তি ও বিশ্বের পারস্পরিক সম্পর্কে জাত আত্মচরিত্র। তাই এই প্রতিমা হয়ে ওঠে একইসঙ্গে কবির বিষয় ও উপায়।''[৮]

—'একই সঙ্গে কবির বিষয় ও উপায়', 'যুদ্ধের চিহ্ন', 'জীবনের সঙ্গে লগ্ন', 'তাই এর প্রয়োগে এসে যায় সমকালীনতা, স্থানকালে বিশেষিত অভিজ্ঞতার চাপ', 'আবার এরই সঙ্গে চলতে থাকে আত্মগঠনেরও প্রক্রিয়া, ব্যক্তি ও বিশ্বের পারস্পরিক সম্পর্কে জাত আত্মচরিত্র।' তাঁর কবিতার চিত্রকল্পে ধরা পড়ে দেশ— দেশোত্তীর্ণ কথা অর্থাৎ সময়ের দেশে এসে যোগ হয় সময়াতীত দেশ— জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক এবং তার মধ্যে আসক্তি নিরাসক্তির যুগলতা, বিষাদ-সুন্দর দুঃখ-আনন্দের মিলন নিবিড় ভালোবাসা। শঙ্খ ঘোষের কবিতার চিত্রকল্পে প্রকাশ পেয়েছে মানুষ এবং পৃথিবীর প্রতি, বেঁচে থাকার প্রতি, প্রতিবেশ-পরিবেশের প্রতি অত্যন্ত গভীর ভালোবাসা।

''বৃষ্টির এই ঝাপটের ভিতর থেকে উঠে আসছে মধ্যরাতের ঘন্টা
বাজনাদার একা ভিজে যাচ্ছে অন্ধকারে

ঘুমের মধ্যে এপাশ ওপাশ করছি আমরা, ঢলে পড়ছি
কোনো কোনো স্বপ্নের গায়ে
বাজনাদার একা ভিজে যাচ্ছে অন্ধকারে

কেউ তার থাবা বুলিয়ে যায় আমাদের কপালের ওপর
জানি না তার কতদূর নখ

মসৃণতা কতদূর, সে কি আমাদের জাগিয়ে দিতে চায়
না কি নিতে চায় আরো বেশি ঘুমে

সেকথা জানি না, শুধু শ্রাবণের গন্ধ ঘিরে নেয় আমাদের ঘুম
আর ভিতরে ভিতরে

আমরা তৈরি হতে থাকি কাল সকালের আধা জীবনের জন্য
বাজনাদার একা ভিজে যায় অন্ধকারে।''[৯]

অন্যদিকে শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতায় স্থিতিস্থাপক মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত— তিন রকমের ছন্দতেই সফল পরীক্ষক। মিশ্রবৃত্তে আবেগ, দর্শন, প্রশ্ন-সমস্যা-সংকট-বিতর্ক, যুক্তির জাল-নাটকীয়তা-প্রবহমান বিবৃতি অথবা আত্মকথন; কলাবৃত্তে প্রতিদিনের যাপন-অপমান-ভালোবাসা, দলবৃত্তে আঘাত-ঘাত সাবলীলভাবে নির্মাণ-সৃষ্টি করেছেন। ছন্দের বন্ধন নয়, ছন্দের শৃঙ্খলকে অবলীলাক্রমে ধারণ করেছেন অলংকার হিসেবে। অনায়াসে মিলিয়েছেন ভাষার কথ্যচাল এবং বাক্‌স্পন্দকে।

পূর্বালোচিত যে, শঙ্খ ঘোষ, মানুষ— সমাজ দেশ কাল আর তাঁর কবিতা পরস্পর বিরোধী বিসংগত ব্যাপার নয় বরং শঙ্খ ঘোষ, মানুষ— সমাজ দেশ-কাল আর তাঁর কবিতার পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এই সচেতন সমাজ-সংবিদ কবির জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির প্রায় এক দশক পরে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার প্রায় অর্ধেক দশক আগে— 'অশ্লেষার রাক্ষুসীবেলায়'। শঙ্খ ঘোষের জন্ম ১৯৩২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ চীন-জাপান যুদ্ধ, জার্মানীতে নাৎসী দলের জয়— হিটলারের উত্থান ও একছত্র তাণ্ডব, হরিজনদের জন্য গান্ধীজির আমৃত্যু অনশন, ইংরেজ কর্তৃক ভারতের জন্য নতুন শাসনবিধি প্রস্তুতকালে প্রায়! অতঃপর হিটলারের হত্যালীলা তথা ফ্যাসিবাদের তাণ্ডব— সারা পৃথিবী জুড়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান— দামামা! ফল হেতু ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা এবং অসংখ্য মৃত্যু-ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ১৯৪৫-এ গিয়ে সমাপ্তি। এই যুদ্ধকালে ভারতবর্ষের অবস্থা ছিল তথৈবচ— ঘরে দ্বন্দ্ব বাইরে মৃত্যু, ফাঁসিকাঠ এবং অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামা-মন্বন্তর এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন। অনতিদূরেই শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন—

''আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
লজ্জা লুকোই কাঁচা মাটির তলে—
গোপন রক্ত যা-কিছুটুক আছে আমার শরীরে, তার
সবটুকুতেই শস্য যেন ফলে।
কঠিন মাটির ছোঁয়া বাতাস পেয়েছি এই সমস্ত দিন—
নীচে কি তার একটুও নয় ভিজে?
ছড়িয়ে দেব দু-হাতে তার প্রাণাঞ্জলি বসুন্ধরা,
যেটুকু প্রাই প্রাণের দিশা নিজে।

ক্ষীণায়ু এই জীবন আমার ছিল শুধুই আগলে রাখা
তোমার কোনো কাজেই লাগে নি তা—

পথের কোণে ভরসাহারা পড়ে ছিলাম সারাটা দিন:
আজ আমাকে গ্রহণ করো মিতা।
...
নিবেই যখন গেলাম আমি, নিবতে দিয়ো হে পৃথিবী
আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা—
মানুষ হবার জন্য যখন যজ্ঞ হবে, আমার হাড়ে
অস্ত্র গোড়ো, আমায় কোরো ক্ষমা।''[১০]

অতঃপর লেখেন— ''দিনগুলি রাতগুলি'' (রচনা ১৯৪৯-৫৪। প্রকাশ ১৯৫৬), ''নিহিত পাতালছায়া'' (রচনা ১৯৬০-৬৬। প্রকাশ ১৯৬৭), ''তুমি তো তেমন গৌরী নও'' (রচনা ১৯৬৭-৬৯। প্রকাশ ১৯৭৮), ''আদিম লতাগুল্মময়'' (রচনা ১৯৭০-৭১। প্রকাশ ১৯৭২), ''মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়'' (রচনা ১৯৭২-৭৩। প্রকাশ ১৯৭৪), ''বাবরের প্রার্থনা'' (রচনা ১৯৭৪-৭৬। প্রকাশ ১৯৭৬), ''বন্ধুরা মাতি তরজায়'' (রচনা ১৯৭৬-৮০। প্রকাশ ১৯৮৪), ''পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'' (রচনা ১৯৭৬-৮০। প্রকাশ ১৯৮০), ''প্রহরজোড়া ত্রিতাল'' (রচনা ১৯৭৭-৮১। প্রকাশ ১৯৮২), ''মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'' (রচনা ১৯৮২-৮৩। প্রকাশ ১৯৮৪), ''ধুম লেগেছে হৃৎকমলে'' (রচনা ১৯৮৪-৮৬। প্রকাশ ১৯৮৭), ''লাইনেই ছিলাম বাবা'' (রচনা ১৯৯১-৯৩। প্রকাশ ১৯৯৩), ''গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ'' (রচনা ১৯৮৭-৯৪। প্রকাশ ১৯৯৪), ''শবের উপরে শামিয়ানা'' (রচনা ১৯৯৪-৯৬। প্রকাশ ১৯৯৬), ''ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার'' (রচনা ১৯৯৭-৯৮। প্রকাশ ১৯৯৯), ''জলই পাষাণ হয়ে আছে'' (রচনা ২০০০-২০০৩। প্রকাশ ২০০৪), ''সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি'' (রচনা ২০০৪-০৬। প্রকাশ ২০০৭), ''মাটি খোঁড়া পুরনো করোটি'' (রচনা ২০০৭-০৮। প্রকাশ ২০০৯), ''গোটাদেশজোড়া জউঘর'' (রচনা ২০০৯-১০। প্রকাশ ২০১০), ''প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে'' (রচনা ২০১২। প্রকাশ ২০১২), ''বহুস্বর স্তব্ধ পড়ে আছে'' (রচনা ২০১৩। প্রকাশ ২০১৪), ''শুনি শুধু নীরব চিৎকার'' (রচনা ২০১৪। প্রকাশ ২০১৫), ''এও এক ব্যথা-উপশম'' (প্রকাশ ২০১৭)। লেখেন মন-মনন, হৃদয়-মেধা, জাদু-বাস্তবতা, যুক্তি-রহস্য-স্বচ্ছতা, ভালোবাসা-নম্রতা আর বিদ্রোহ-বিদ্রুপ, প্রতিবাদ আর দুর্বলতা অথবা নিজের নিজ-শ্রেণীর চরিত্রাবস্থা, ব্যক্তি আর সমাজের নানা মুহূর্তের খণ্ডগুলি সম্পৃক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্খ-সমগ্র। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকাংশে বলা 'সত্যি বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার' এবং 'সমস্তটা মিলিয়ে আদ্যন্ত একটিই-যে নাটক গড়ে উঠবার কথা ছিল'— তা হয়ে উঠেছে 'প্রগল্‌ভতাহীন' সমগ্র— সমাজ দেশ কালের অভিঘাতময় আত্মপরিচয়ের স্বতন্ত্র সমগ্র। তিনি নিজেই নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নেন তিমিরের ছিন্ন শির, ভিখিরি ছেলের দৃষ্টিতে দেখে নেন নিজ-শ্রেণীর মুখ-মুখোশ, বর্বর জয় আর উল্লাস এবং নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে প্রার্থনা— এখানেই শঙ্খ

ঘোষের অনন্য স্বতন্ত্রতা। স্বনির্বাচিত গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বাক্-স্বাধীনতা অঞ্চলেও কেবলমাত্র আকস্মিক জন্ম অনিবার্য মৃত্যু অমোঘ যৌনতার কথা নয়, এইসব নিত্য সত্য এবং সত্যের উপরে ভর করে যে জীবন চলেছে ভবিষ্যতের দিকে, তাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংঘর্ষে আঁকেন। আর তাতে কবির 'আমি' এবং বাইরের 'সমাজ' মুখোমুখি হয়ে তৈরি হয়ে উঠেছে আরেকটি 'তৃতীয় সত্তা'— যাতে অতীত আর ভবিষ্যতের কথা উঠে আসে দেশের সময়ের পথ বেয়ে দেশোত্তর পটভূমিতে। একজন সমালোচক লেখেন—

> ''বহিস্থকে আত্মস্থ করিবার জন্যে আত্মস্থকে ধ্বংস করিবার যে এই অতুলনীয় কাব্যক্রিয়তা তাহাতে তো শুধুই অগ্নি নাই, শুধুই দহন নাই, শুধুই দগ্ধচিহ্ন নাই। তাহার বিপরীতে এক হিমদেশ আছে। সেই হিমদেশের শৈত্যে আত্মস্থতা জড়ীভূত হইয়া যায়। সেই হিমদেশের কুয়াশার মতো আত্মস্থতা প্রেতের মতো পদস্পর্শহীন ঘুরিয়া বেড়ায়। সেই বহিস্থ গভীর খাদ ও সানুর আকারে আত্মস্থকে গ্রাস করিয়া ফেলে। শঙ্খ ঘোষের কাব্যপ্রতিভা যে কতটাই নিজেকে অতিক্রম করিতে ক্ষমতাবান তাহার এই এক ভীতিকর প্রমাণ যে তিনি তাঁহার আত্মস্থতাকে শুধু একপ্রকারে চূর্ণ করিয়া তুষ্ট হন না, তাহাকে আরো এক প্রকারে হিমস্তরের শৈত্যে প্রোথিত করেন।''[১১]

শঙ্খ ঘোষ লিখে চলেছেন— প্রতিদিনের 'সংকট' ধারণ ও অতিক্রম করে-করে। লিখে চলেছেন গভীর এবং গাঢ়, নিঃশব্দে অথচ উন্মোচন, সংযোগে। নির্জনতর আর নীরবতায় ভালোবাসা-জীবনের কথা। তাঁর ''দিনগুলি রাতগুলি'' (১৯৫৬) থেকে সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ ''এও এক ব্যথা-উপশম'' (২০১৭)-এ পর্যন্ত তিনি সময়-রাজনীতি-দেশসচেতন এবং আত্মার সংযোগ-সেতু নির্মাণের বিশ্রামবিহীন রূপকার, তাই নিছক কোন ঘটনা বা ঘটনাপ্রবাহ নয়; সমস্ত সংকট-ক্ষয়-শবের মিছিল থেকেও উঠে আসে গভীর মনন-সংযমের উজ্জ্বল আলো, আত্মনির্মাণের আলো।

তথ্যসূত্রঃ

১. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ১৩৯।

২. তদেব : পৃ. ১৮।

৩. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২১, পৃ. ৩০৮

৪. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি

স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ২১৪।

৫. ঘোষদস্তিদার, গৌতম (সম্পা.): বিষয় শঙ্খ ঘোষ, রক্তমাংস, কলকাতা-৭০০১১৮, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১২০-১২১।

৬. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (সম্পা.): কৃত্তিবাস পঞ্চাশ বছর (নির্বাচিত সংকলন-১), আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০০৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৩।

৭. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ৭৯।

৮. ঘোষ, শঙ্খ : গদ্যসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৬৫

৯. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ, পৃ. ৯১, ৯২।

১০. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ন ১৪১৬, পৃ. ৩২।

১১. রায়, দেবেশ (সম্পা.) : শতসানুদেশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৫০।